নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতি নয়
বিপ্লবী আন্দোলনই মুক্তির পথ

অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়লেই তো হয় না, বুঝতে হবে লড়াইগুলোর রাজনৈতিক লক্ষ্য কী। মুখে বলা হল, রাজনৈতিক লক্ষ্য বিপ্লব, শোষণমুক্তি। এ তো ভাসা ভাসা ভাবে বলা। বিপ্লবটা কী? শোষণমুক্তি কীভাবে হবে? এদেশে কারা শোষণ করছে? কীভাবে তাদের উৎখাত করা হবে? এই ভাষণের মধ্য দিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই গুলিরই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।

আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজকের এই সভায় আপনারা সকলে সমবেত হয়েছেন। অন্যান্য বারের মতোই এবারেও আলোচনার জন্য বহু প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছে। এর মধ্যে যেমন আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের নানা বিষয় রয়েছে, তেমনি রয়েছে জাতীয় পরিস্থিতির নানা দিক, রয়েছে আমাদের দেশের এবং পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনের নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন। যেমন ন'পার্টির ঐক্য কেন ভাঙল? জয়প্রকাশবাবুর আন্দোলন সম্পর্কে আমরা কী ভাবছি? বিহারে জয়প্রকাশবাবুর আন্দোলনে আমরা আছি, অথচ এখানে 'নবনির্মাণে'র সঙ্গে যেতে আমাদের আপত্তি কেন? এ রকম হাজার একটা প্রশ্ন আলোচনার জন্য আমাকে করা হয়েছে। সমস্ত প্রশ্নগুলো একটা সভায়, একটা বক্তৃতার মধ্যে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এর যে কোনও একটা বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে তাতে আজকের সভায় আমি যতটুকু বলব তার প্রায় পুরোটাই লেগে যেতে পারে। স্বভাবতই, তা সম্ভব নয়। ফলে আমি মূলত আমাদের

দেশের বর্তমান অবস্থা এবং এদেশে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত জরুরি এবং আলোচনা হওয়া দরকার, সেই বিষয়গুলি এখানে আলোচনা করব।

শুরুতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার। কাম্বোডিয়াতে দীর্ঘদিন সশস্ত্র লড়ালড়ির পর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের 'পুতুল' সরকারকে উচ্ছেদ করে সেখানে বিপ্লবী জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সায়গনেরও পতন অবশ্যম্ভাবী — একথাও দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ভিয়েতনামের মতো একটা ক্ষুদ্র দেশের জনগণের লড়াইয়ের সামনে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের এতবড় মিলিটারি শক্তি, এত বোমা-বারুদ, এত তাকত, এত আয়োজনও কোনও কাজেই এল না। পিছু হটতে তারা বাধ্য হল। ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের এই বিজয় দুটো জিনিস দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করে দিল। একটা হল, আমেরিকার মিলিটারি শক্তি সম্বন্ধে যে মিথ, যে ভয়, যে আতঙ্কের ধারণা দুনিয়ায় কাজ করছে , তা আসলে কিছু নয়। সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে এবং সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শোষিত জনগণের সশস্ত্র বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান যদি ঘটে, তাহলে আমেরিকান মিলিটারি শক্তিও তাকে দমন করতে পারে না। দুনিয়ায় আমেরিকান মিলিটারি শক্তিই শেষ কথা নয় । শেষ কথা হচ্ছে, জনসাধারণ, বিপ্লবের সঠিক রাজনৈতিক লাইন এবং জনগণের সঠিক বিপ্লবী পার্টি।

দ্বিতীয় আর একটি জিনিস এই লড়াই দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করেছে, তা হচ্ছে, দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন এবং স্বাধীনতার সংগ্রামগুলোকে জয়যুক্ত করাই বিশ্বশান্তির একমাত্র গ্যারান্টি। একমাত্র এই পথেই সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করা সম্ভব এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সম্ভাবনাকেও এড়ানো সম্ভব। তোষামোদ করে, আন্তর্জাতিক কনফারেন্স করে, ফরমূলা বের করে, কূটনৈতিক চ্যানেলে বোঝাপড়া করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ধমকি বা সাম্রাজ্যবাদকে তার আগ্রাসী নীতি থেকে হঠানো যাবে না। চীন এবং ভিয়েতনামের ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কর্তৃক গৃহীত এই সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের বিজয় এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছে। ইন্দোচীনের বিপ্লবী আন্দোলনের এই সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে, সোভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃত্ব কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক লাইন কত ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর। লেনিন-স্ট্যালিনের হাতে-গড়া সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ক্রুশ্চেভের প্রতিষ্ঠার পথ ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে শোধনবাদের সিংহদ্বার খুলে গিয়েছিল, সেই শোধনবাদের পথে এগোতে এগোতে সোভিয়েটের

বর্তমান নেতৃত্ব আজ বাস্তবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং কার্যত চূড়ান্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এরই ফলে তারা বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোর ক্ষেত্রে 'কমপ্রোমাইজ' করেছে, বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে যথার্থ অর্থে মদত ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে ভয় পেয়েছে। তাদের তত্ত্ব ছিল, সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে গেলেই যুদ্ধ বেধে যাবে, আর যুদ্ধ বেধে গেলে তা থেকে আণবিক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা যদি অপর দেশে চড়াও হয়ে আক্রমণ চালায়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক শিবির এতবড় শক্তি নিয়ে বসে বসে দেখবে, না হয় 'কূটনৈতিক চ্যানেলে' চেষ্টা করবে, অথবা দু'একটা প্রতিবাদ সভা করবে, বা একটা প্রতিবাদ লিপি পাঠাবে, আর পারলে আক্রান্ত দেশকে সামান্য কিছু সাহায্য করবে। এর বেশি তাদের আর কিছু করার নেই। এইভাবে একটা যুদ্ধাতঙ্ক থেকে সাম্রাজ্যবাদকে তারা একের পর এক 'কনসেশন' দিয়ে গিয়েছে। অথচ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আবির্ভাব ছিল বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তি আন্দোলনগুলির সামনে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সমাজতান্ত্রিক শিবির আসার আগে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের খেয়াল খুশি ও মর্জি মতো যখন তখন একটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করেছে, যে কারণে তখন একটা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে শুধু তার দেশের শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়নি, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণেরও মোকাবিলা করতে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবির আসার পর সে আওয়াজ তুলল — অপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। লেনিনের শিক্ষার আলোকে স্ট্যালিন নিয়ে এলেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি — যার অর্থ, প্রত্যেকে তার তার ব্যবস্থা নিয়ে থাকবে, কেউ কারোর ব্যাপারে নাক গলাবে না। সমাজতান্ত্রিক শিবির কাউকে আক্রমণ করবে না। তুমিও সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা কোরো না। তুমি কোনও দেশকেই আক্রমণ করতে পার না। কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পার না। তুমি কারোর গার্জিয়ান নও। দুনিয়ার কোথায় কী হচ্ছে দেখার জন্য কেউ তোমাকে গার্জিয়ান নিযুক্ত করেনি। তোমার গণতন্ত্রের প্রচার তুমি কর। তোমার পুঁজিবাদের প্রচার তুমি কর। তোমার মুক্ত দুনিয়ার প্রচার তুমি কর — যেমন কমিউনিস্টরা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিপ্লবী তত্ত্বের প্রচার করে। একটা দেশের জনসাধারণ যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, বিপ্লব ফেলে দিয়ে তোমাদের গণতন্ত্র, আর মুক্ত দুনিয়ার আদর্শ গ্রহণ করে, তারা সেই পথেই চলবে। সমাজতান্ত্রিক শিবির এ নিয়ে

জবরদস্তি করবে না। কিন্তু তারা যদি বিপ্লব গ্রহণ করে, তাহলে সেই বিপ্লবকে গণতন্ত্র আর মুক্ত দুনিয়ার নামে দমন করার 'গার্জিয়ানশিপ' তোমাকে কে দিয়েছে?

অপর দেশে চড়াও হয়ে সাম্রাজ্যবাদের এই হানাদারিকে আগে রোখা যায়নি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবির একটা বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পর, বিশেষ করে স্ট্যালিনের সময় পর্যন্ত তা দেশে দেশে স্বাধীনতার লড়াই, বিপ্লবী লড়াইয়ের 'গ্যারান্টার' হিসাবে, দুর্গ হিসাবে কাজ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরাট শক্তিবৃদ্ধি, সামরিক শক্তির দিক থেকে সোভিয়েটের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, চীন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিজয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর দেশে দেশে শান্তি আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের অভূতপূর্ব জোয়ার ও শক্তিবৃদ্ধি — এই অনুকূল পরিস্থিতিতে, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরও চীন ও রাশিয়া যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল ভিত্তি ও সঠিক লাইন নিয়ে একসঙ্গে একটা বিরাট শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে পারত, তবে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী সংগ্রামগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার একটা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। তাহলে ভিয়েতনামের সংগ্রাম এত দীর্ঘতর হত না, এত লোকক্ষয় সেখানে হত না। গোটা দেশটা আমেরিকার বোমাবাজিতে মরুভূমিতে পর্যবসিত হত না। কিন্তু স্ট্যালিন পরবর্তী সোভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ভ্রান্ত লাইনের জন্য তা সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদও তার কোণঠাসা অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আরও মারমুখী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদকে রোখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এই নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদকে তোষামোদ করা এবং তার কাছে আত্মসমর্পণের নীতি দীর্ঘকাল অনুসরণ করে গিয়েছে এবং এইভাবে বিপ্লবী লাইন থেকে হঠতে হঠতে আরও এক ধাপ এগিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের দুষ্ট রাজনীতিতে সামিল হয়েছে। এ শুধু ভ্রান্ত পথই নয়, এ এক সর্বনাশা পথ। এদের এই তত্ত্বের সাথে বিপ্লব, কমিউনিজম ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ায় এই বিজয় এবং লাওসে-ও বিপ্লবী অভ্যুত্থান কিছুদিনের মধ্যেই ঘটতে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। অর্থাৎ পুরো ইন্দোচীনে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ পিছু হঠার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের একটা 'লিংক' বা 'চ্যানেল' ভেঙে গেল এবং তার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হল। এর দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে বিশ্বে একটা প্রবল জোয়ার এবং আশার সঞ্চার হবে।

ইন্দোচীনের ঘটনা দেখিয়ে দিল, তোষামোদ করে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হুমকি এড়ানো যায় না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হুমকি এবং বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে সংঘর্ষ নিরন্তর চলছে। যেখানেই গণআন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন সঠিক বিপ্লবী লাইন গ্রহণ করতে পারছে, শোধনবাদী তত্ত্বকে পরাস্ত করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতির ভিত্তিতে লড়াই চালাতে পারছে, সেখানেই বিপ্লব চূড়ান্ত সফলতার দিকে এগোচ্ছে, বিপ্লব জয়যুক্ত হচ্ছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের অবস্থার দিকে তাকালে আমরা কী দেখব? এখানে আমরা দেখছি, বহু হতাশা বহু নিরাশার মধ্যেও ভারতবর্ষে আবার একটা গণআন্দোলনের ঢেউ আসব আসব করছে। গুজরাটে একটা দমকা হাওয়ার মতো, অনেকটা তুফানের মতো লড়াইয়ের একটা প্রবল ঢেউ বয়ে গেল। বিহারে একটা ঢেউ চলে গিয়ে আবহাওয়া থমথম করছে। পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলনের হাওয়া গরম হয়ে উঠছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে আজ হোক, কাল হোক, নেতৃত্ব যেমনই হোক, বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে প্রবল গণআন্দোলনের ঢেউ দেখা দেবে, যেমন বিহারে বামপন্থীরা ছিল না বলে আন্দোলন বসে থাকেনি। লক্ষ লক্ষ জনতার আন্দোলনে সামিল হতে আটকায়নি। যারাই নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে, আন্দোলনের দাবিগুলো যথার্থ বলে জনসাধারণ সেইসব নেতৃত্বকেই কেন্দ্র করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেখানে যে নেতৃত্ব, তা প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বলেই আমরা মনে করি এবং আমাদের মতো অনেকেই মনে করে। কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আছে বলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেই আন্দোলনকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না, বা এই যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে যোগ দিল, সেই মানুষগুলোকে তো আর প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না।

এখানে আমি যে প্রশ্নটি আপনাদের সামনে রাখতে চাইছি, তা হল, অতীতেও এদেশে আন্দোলন হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ লড়াইতে এসেছে, বহু নেতার নেতৃত্বে এবং নানা দলের নেতৃত্বে এসেছে। এসেছে কখনও এককভাবে বা কখনও সম্মিলিতভাবে। একথা তো বলা যাবে না যে, আমাদের দেশের শ্রমিক-চাষি-নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ লড়তে চায় না, প্রাণ দিতে জানে না। এটা ঘটনা নয়। এদেশের মানুষ অতীতেও লড়েছে, ভবিষ্যতেও আবার লড়বে। কিন্তু আন্দোলনের যখন একটা ঢেউ আসে, আন্দোলনের যখন একটা গরম হাওয়া চলতে থাকে, তখন আন্দোলনের রাস্তা ঠিক কি না, তার আদর্শ, তার নেতৃত্ব

ঠিক কি না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ ভাবে না, বা তাদের ভাবানোর কোন চেষ্টাও হয় না। অথচ তারাই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারাই মরে, তারাই মার খায়, গুলি খায়, জেলে যায়। আন্দোলনে ক'জন নেতা এ পর্যন্ত আমাদের দেশে মারা গিয়েছে? যদি কখনও কোনও নেতা মারা গিয়েও থাকে, সেটা অ্যাকসিডেন্ট। ক্ষয়ক্ষতি লোকসান যা কিছু হয় সব আপনাদের, সাধারণ মানুষের।

আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর, আন্দোলনে মার খাওয়ার পর আপনারা খতিয়ান করতে বসেন। আপনারা বলতে থাকেন, 'এই তো এত লড়লাম, এত পরিবার নষ্ট হয়ে গেল, এত লোক প্রাণ দিল, কী হল? এদেশে কিছু হবে না। সব চোর, সব শয়তান।' যখন লড়াই চলে, আন্দোলনের হাওয়া গরম হয়, তখন আদর্শ বা রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্ন তুললেই আপনারা বলেন, 'এখন কোনও আলোচনা নয়, এখন লড়াইয়ের সময়।' আবার সেই আপনারাই আন্দোলনে পরাজিত হয়ে, মার খেয়ে বলতে থাকেন, 'ও অনেক লড়ে-টড়ে দেখা গেছে, ও সব করে কিছু হবে না।' চূড়ান্ত হতাশা, নিরাশা আপনাদের গ্রাস করে, অনাস্থা, অবিশ্বাস মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কারও কথা তখন তারা শুনতে চায় না, কাউকেই বিশ্বাস করতে চায় না।

তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, লড়াইটাই একমাত্র কথা নয়। যেমন, শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করেই চলেছে। পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াবার জন্য লড়ছে। মাইনে পাঁচ টাকা বাড়ল তো দেখা গেল, জিনিসপত্রের দামও আরও বেড়ে গেছে। আবার কিছুদিন বাদে আর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াবার জন্য শ্রমিক লড়াইয়ে নামছে। মাইনে বাড়াবার এ লড়াই শ্রমিক করেই চলেছে, করেই চলেছে। এর দ্বারা মজুরের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি? দেশের অবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে কি? শোষণের অবসান হয়েছে কি? শোষকদের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে কি? না, তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

তাহলে একটা লড়াই করলেই তো হয় না, লড়াইয়ের উদ্দেশ্য কী? অর্থনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক যে দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়াই, সেগুলো তো এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সংস্কারের জন্য এবং অর্থনৈতিক কিছু দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য কতকগুলো লড়াই। এই লড়াইগুলোর রাজনৈতিক লক্ষ্য কী? মুখে বললাম, রাজনৈতিক লক্ষ্য বিপ্লব, শোষণমুক্তি। এ তো গোল গোল করে, ভাসা ভাসা ভাবে বলা। বিপ্লবটা কী? শোষণমুক্তি কীভাবে হবে? এদেশে কারা শোষণ করছে? কীভাবে তাদের উৎখাত হবে?

'সরমায়াদার কো উখাড় ফেকনা হোগা', 'ক্রান্তি করনি হোগী' — এসব স্লোগান তো দীর্ঘদিন ধরে মজুররা দিয়ে আসছে। তার দ্বারা মজুরদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা, বৈপ্লবিক সংঘশক্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়েছে কি? অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার এই লড়াইগুলোর সঙ্গে শুধু বিপ্লব আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কথাটা জুড়ে দিলে, আর তার সঙ্গে লড়াইটাকে মারমুখি ঢঙে পরিচালনা করলেই সেটা বিপ্লবী আন্দোলন হয়ে যায় নাকি? তাহলে সংস্কারবাদী আন্দোলন কাকে বলে? সংস্কারবাদী আন্দোলন মারমুখি হয় না? চাষিদের মধ্যে জমি বিলি করা, তার জন্য আইন পাশ করার আন্দোলন তো পার্লামেন্টারি রাজনীতির আন্দোলন। এটা তো বিপ্লবী আন্দোলন না। তার জন্য ইতালিতে চাষিরা অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেনি? এই অস্ত্র নিয়ে জমি দখল, জমি বিলি এবং তাকে আইনসঙ্গত করার জন্য আইন পাশ করার যে লড়াই, সেই লড়াই সেখানে চাষিরা করেছে, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে লড়েছে বলেই কি সেই লড়াইগুলো বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের লড়াই হয়ে গেছে? ব্যাপারটা এত সোজা নয়। তাহলে আমাদের গণআন্দোলনগুলো এত মারমুখি ও জঙ্গি হওয়া সত্ত্বেও এবং তার সাথে বিপ্লব ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এত স্লোগান দেওয়া সত্ত্বেও সেগুলো অর্থনীতিবাদ আর সংস্কারবাদের গন্ডির মধ্যে আজও আটকে থাকত না। শুধু কি তাই? এত লড়াই, এত কোরবানির পরেও শোষক সম্প্রদায় এবং তাদের শাসন ব্যবস্থার গায়ে আমরা আঁচড়টুকুও কাটতে পারিনি। বরং প্রতিটি আন্দোলনের পর শোষকশ্রেণি এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়েছে, প্রতিক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়েছে। অন্যদিকে আন্দোলন আরও কমজোর হয়েছে, ছত্রখান হয়ে গিয়েছে, মানুষের মনে হতাশা, নিরাশা বেড়েছে। মানুষের জীবনে কোনও মৌলিক পরিবর্তন তো আসেইনি বরং পুঁজিবাদী শোষণের নাগপাশ আরও শক্ত হয়ে তাদের বুকে চেপে বসেছে।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, আন্দোলনে জয় পরাজয় তো আছেই। আন্দোলনে জয় যেমন আছে, পরাজয়ও আছে — একথা আমি জানি। সমস্ত বড় বিপ্লবীরাই বলে গিয়েছেন, বিপ্লবী আন্দোলন পরাজয়ের মধ্য দিয়েই শুরু হয়। মাও সে-তুঙ বলেছেন, গোড়ায় বিপ্লবী লড়াইকে বারবার পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু এই পরাজয়ের মানে কী? অভিজ্ঞতার অভাবে আন্দোলনকে হয়ত বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না, শোষকশ্রেণির আক্রমণের মুখে হয়ত মানুষ দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারল না, বা আন্দোলনের দাবি অপূরিত থেকে গেল। কিন্তু এইরকম প্রতিটি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে গণআন্দোলন

কদম কদম এগোয়। জনগণের চেতনা ও সংঘশক্তি বাড়তে থাকে। বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী মোর্চা শক্তিশালী হয়। আর মালিকদের কবর খোঁড়া হতে থাকে। শত্রুপক্ষ ক্রমেই কমজোর হয়, বিচ্ছিন্ন হয়। এই পথেই প্রতিটি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে শক্তি সঞ্চয় করতে করতে শেষপর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলন চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

কিন্তু আমাদের পরাজয়গুলো কি এরকম? আমাদের পরাজয়গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কি গণআন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছি? অভিজ্ঞতার দ্বারা খানিকটা হলেও এগোতে পেরেছি? আমাদের ক্ষেত্রে পরাজয়ের ফল দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি, আমাদের মধ্যে ভাঙন এসেছে, কাপুরুষতা এসেছে, লড়াই করবার অনীহা সৃষ্টি হয়েছে, বিভেদ এসেছে, হতাশা এসেছে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি বেড়েছে। দেশে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার বেড়েছে। সমাজজীবনে অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক অধঃপতন ছেয়ে গেছে। তাহলে আমাদের পরাজয় তো শুধু পরাজয় নয়। আমাদের পরাজয়ের পথে প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত হয়েছে, আর বিপ্লবী শক্তি, বামপন্থী আন্দোলন দিনের পর দিন কমজোর হয়েছে, দুর্বল হয়েছে। এর কারণ কী? সাহসের সঙ্গে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের লড়াই ও আন্দোলনগুলোর সামনে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যে কোনও 'সিরিয়াস' কর্মী এই প্রশ্নটিকে গৌণ করে দেখতে পারে না। দেখলে তাকে আর রাজনৈতিকভাবে সচেতন কর্মী বলা যায় না। গণআন্দোলনের মধ্যে এই সমস্যার উপর গুরুতর আলোচনা করতে একমাত্র পেটিবুর্জোয়া রাজনীতিবিদরাই অস্বীকার করে। আলোচনা- সমালোচনা ও আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনতাকে রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং তাদের সংগঠিত করাই হচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবী দলের কাজ। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, এই মূল প্রশ্নটিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। এই মূল কথাটা বুঝতে হলে প্রথমে দুটো জিনিস বোঝা দরকার। একটি হল, আমরা যদি এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাই তাহলে বুঝতে হবে, এটা কি সমাজব্যবস্থা? তাকে কীভাবে পরিবর্তন করব? করে সেখানে আমরা কী বসাতে চাই? আর এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সামনে প্রধান বাধা কী? মূল শত্রু কে? কাকে হটাতে হবে? রাষ্ট্রের চরিত্র কী? অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, গণআন্দোলনগুলোকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে তার বিপ্লবী রাজনীতির রণনীতি কী হবে? আন্দোলনের কলাকৌশল, তার নিয়ম-কানুন, তার কৌশলগত পথ কী হবে? এই জিনিস দুটো যদি আমাদের উপলব্ধিতে না আসে, তাহলে আমরা বারবার লড়ব, বারবার অর্থনৈতিক এবং

গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে ময়দানে আসব, আত্মত্যাগ হবে, কিন্তু লড়াইগুলো অর্থনীতিবাদ আর সংস্কারবাদের গণ্ডি পেরিয়ে তার রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না। ফলে এই লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে, অতীতেও যেমন বারবার ঘটেছে, জনতার অশেষ আত্মত্যাগের বিনিময়ে সরকার-বিরোধী যে চেতনা জন্ম নেয়, যারা ইলেকশন রাজনীতিবিদ, যারা পার্লামেন্টারি পার্টি, তারা ইলেকশন রাজনীতিতে তার ফয়দা ওঠায় মাত্র।

আপনাদের বুঝতে হবে, গণআন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক লাইনের, বিভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য। গণআন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে এই বিরোধ সম্পর্কে আপনি সচেতন থাকুন বা না-থাকুন, এই বিরোধ দেখা দেবেই। একে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। যারা এই সত্যটাকে অস্বীকার করে, তারা আসলে কথার চালাকিতে, নানা যুক্তিজালের আড়ালে অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে গণআন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে মূলত অসচেতন রাখতে চায় এবং এই সংস্কারবাদী গণ্ডির মধ্যেই আন্দোলনকে আটকে রেখে তার কোরবানির ফলটুকু ইলেকশান রাজনীতিতে তুলতে চায়। কিন্তু যারা আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ আর সংস্কারবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাকে বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চায়, তারা এর ভেতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক লাইন, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে অবশ্যম্ভাবী রূপে যে আদর্শগত সংগ্রাম ঘটে, তাকে অস্বীকার করে না। বরং তারা এই আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন লাইনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জনতার সামনে পরিষ্কার করে দেয় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা আন্দোলনগুলোকে সংস্কারবাদ বা অর্থনীতিবাদের গণ্ডির বাইরে নিয়ে এসে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেয়, যথার্থ বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে এগুলোকে গড়ে তোলে এবং ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে যায়।

এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক লাইনের মধ্যে সংগ্রামের বিষয়ে আরও আলোচনায় যাওয়ার আগে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার একটা নকশা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের দেশের সামনে মূল সমস্যা কী? অভাব, অনটন, অত্যাচার এগুলোর ফিরিস্তি দেওয়া আমি পছন্দ করি না। আপনারা নিজেদের জীবন থেকেই সেগুলো জানেন। আমি মৌলিক সমস্যাটা আপনাদের ধরাতে চাইছি। সেটা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে শিল্পের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে আসছে বারবার। বারবার ভারতবর্ষের শিল্প অর্থনীতি মন্দা এবং সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি ছোট ছোট খেত-

খামারে আটকে থাকছে। এখানে কৃষির আধুনিকীকরণ এবং বৈজ্ঞানিকীকরণ করা হচ্ছে না। অথচ, এটা ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যা দূর করা, শিল্পের অগ্রগতির জন্য কাঁচামাল জোগান দেওয়া, এবং গ্রামের বেশিরভাগ মানুষগুলো যে আদিম, অসভ্য এবং প্রায় জানোয়ারের স্তরে অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন অবস্থায় জীবনযাপন করে, তার থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য একান্ত দরকার।

এই কৃষি সমস্যা নিয়ে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি আমাদের দেশে চলছে। সকলেই বলছে, দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আবার, একমাত্র এস ইউ সি আই ছাড়া কংগ্রেস থেকে শুরু করে সি পি আই, সি পি আই(এম), নকশালপন্থী, দক্ষিণপন্থী, চরম দক্ষিণপন্থী সমস্ত দলের কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচি যদি বিচার করেন, তাহলে দেখবেন, সকলেই প্রকারান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থাকে ছোট ছোট খেত-খামারের মধ্যে আটকে রাখতে চাইছে। অর্থাৎ পাঁচ বিঘা, সাত বিঘা, দশ বিঘা, নয় বিঘা করে জমি বণ্টন করে চাষবাস এবং চাষিদের মধ্যে এই জমি বণ্টন করাই তাদের সকলেরই কৃষি সমস্যা সমাধানের মূল এবং একমাত্র কর্মসূচি। বি এল ডি'র প্রোগ্রামেও এই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে অন্যরকমভাবে আসছে। তারা 'লঘু উদ্যোগের' কথা বলছে, অর্থাৎ গ্রামে ছোট ছোট শিল্প করবে এবং ছোট ছোট খেত-খামারে চাষবাসের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। কংগ্রেসও কৃষিতে ব্যাপকহারে ট্র্যাক্টর ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে অস্বীকার করে, গ্রামে ছোট ছোট কো-অপারেটিভ গড়ে তুলে মধ্য চাষি, ছোট চাষিকে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করার দ্বারা আসলে জমি বিলি, সিলিং কমানো প্রভৃতি নীতিতে বেশিরভাগ মানুষকে গ্রামীণ অর্থনীতিতেই অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন অবস্থায় আটকে রাখতে চাইছে; এবং তারাও ছোট ছোট খেত-খামারের কথা বলছে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বন্ধুরাও বড় বড় জমির মালিকদের জমি বাজেয়াপ্ত করে গরিব ও ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বিলি করার কার্যক্রমকেই মুখ্য ও একমাত্র কার্যক্রম বলে গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের দেশের কৃষি সমস্যার এটাই একমাত্র সমাধান বলে নিদান দিয়েছেন। আমাদের দেশে যাঁরা 'ভূদান' নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁরাও এক সময় বড় বড় জমির মালিকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি চেয়ে নিয়ে গরিব চাষিদের মধ্যে সেই জমি বণ্টন করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও ভেবেছিলেন, চাষিদের মধ্যে এই জমি বণ্টন করে দিলেই গ্রামীণ জীবনের উন্নতি ঘটবে। ভূদানিদের এই প্রচেষ্টার ফল কী দাঁড়িয়েছিল? বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চাইলেই জমি পেয়ে যাবেন, ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। ফলে বাস্তবে চাষিদের শুধু কাগজই মিলেছে, জমি মেলেনি। আর জমি বলে

ছিটেফোঁটা যা মিলেছে, রাষ্ট্র যদি সেগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় চাষোপযোগী করে না দেয়, তবে গরিব চাষিদের সে জমি চাষ করার সাধ্যও নেই।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গরিব চাষি ও ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে এই জমি বিলি করে দিলেই কি আমাদের দেশের কৃষি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? জমি তাদের দিলেও তারা কি সেই জমি ধরে রাখতে পারবে? আজ যারা গরিব চাষি, ভূমিহীন চাষি, খেতমজুর দেখছেন, খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন, কয়েক পুরুষ আগে তাদের অনেকেরই জমি ছিল। তাহলে যাদের জমি ছিল, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রক্রিয়া চালু হওয়ার ফলে জমি থাকা অবস্থাতেও তারা জমি ধরে রাখতে পারেনি, জমি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, সমাজ অভ্যন্তরে যদি সেই প্রক্রিয়া চালু থাকে, তাহলে জমি দিলেও তারা কি সেই জমি ধরে রাখতে পারবে? সেই একই প্রক্রিয়ায় তো আবার তারা ভূমিহীন হবে।

তাছাড়া গ্রামে লোকসংখ্যা বাড়ছে প্রতিটি পরিবারে। কিন্তু জমির পরিমাণ একটা দেশে বাড়ে না এবং ক্রমাগত জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোরও একটা সীমা আছে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এই মানুষগুলোর মধ্যে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ হচ্ছে ভূমিহীন খেতমজুর। যদিও এদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যায় এক থেকে দুই বিঘা জমি কোথাও কোথাও কারোর আছে। এদের গ্রামীণ সর্বহারা বলতে পারেন। আর যাদের তিন বিঘা থেকে সাত-আট বিঘা পর্যন্ত জমি রয়েছে, যাদের আমরা গরিব চাষি বলি, গ্রামে তাদের সংখ্যা হবে শতকরা প্রায় পনেরো ভাগ। তাহলে এই দু'য়ের সংখ্যা মিলে দাঁড়াল শতকরা সত্তর ভাগ। আর সাত-আট বিঘা থেকে পনেরো বিঘা পর্যন্ত, সেচ এবং অসেচ মিলিয়ে, জমির মালিক নিম্ন মধ্যবিত্তদের এর সঙ্গে মেলালে গ্রামে এই জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা আশি থেকে তিরাশি ভাগ। মোটামুটি দু-এক ভাগ বাড়তে বা কমতেও পারে। এই যে গ্রামের শতকরা আশি থেকে তিরাশি ভাগ লোক সর্বহারা, অর্ধ-সর্বহারার স্তরে নেমে গিয়েছে — এই সংখ্যাটা তো গ্রামে দিনের পর দিন বাড়ছে, কিন্তু জমি তো বাড়ছে না। এই অবস্থায় খানিকটা জমির সিলিং কমিয়ে এবং বেনাম জমি উদ্ধার করে যতদূর সম্ভব ভূমিহীন এবং গরিব চাষিদের অন্তত নয় বিঘা করেও জমি যদি দেওয়া যায়, তাহলেও কত লোককে আমরা জমি দিতে পারব?

একথার মানে এ নয় যে, সিলিং কমিয়ে এবং বেনাম জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন চাষি ও গরিব চাষিদের মধ্যে জমি বিলি করার প্রয়োজনীয়তাকে আমি

অস্বীকার করছি। বরং আমি মনে করি, চাষি আন্দোলনের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, এই নয় বিঘা করে জমি ভূমিহীন ও গরিব চাষিদের মধ্যে বিলি করলেও গ্রামে যে বিরাট জনসংখ্যা জমির উপর নির্ভর করে আছে, তার অর্ধেক মানুষকেও আমরা জমি দিতে পারব না। তাহলে বাকি মানুষগুলোর কী হবে? তাদের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন তো থেকেই গেল।

দ্বিতীয়ত, সংসারে চাকরি-বাকরি করে রোজগার করার লোক না থাকলে এই নয় বিঘা জমিও আজকের দিনে 'ইকনমিক হোল্ডিং' বলে আমি মনে করি না। চাকরি-বাকরি করে তার থেকে টাকা এনে উন্নত ধরনের চাষবাস না করতে পারলে এই নয় বিঘা জমিই চাষি ভাল করে চাষবাস করতে পারবে না এবং চাষ করে কোনও মতে সংসারই চালাতে পারবে না। ফলে গোটা দেশের কৃষি উৎপাদন মার খাবে। জমি ভাল করে চাষ হবে না। ফলন কম হবে। তার প্রভাব পড়বে খাদ্য সমস্যার উপর। আর তার প্রভাব গিয়ে পড়বে শিল্প অর্থনীতির উপর। শুধু দলীয় রাজনীতির জন্য যারা ওই কথাগুলো বলে, তারা গোটা দেশের সমস্যা নিয়ে ভাবে নাকি ?

তৃতীয়ত, যাদের নয় বিঘা করে জমি দেওয়া হল, তাদের এই জমিতে চলে কি না, সেকথা ছেড়ে দিলেও, সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের যদি তিনটি করে সন্তানও হয়, তাহলে এই নয় বিঘা জমি তিন বিঘা করে এক একজনের ভাগে পড়বে এবং তাদের আবার তিনটি করে সন্তান হলে এক একজন এক বিঘা করে জমির মালিক হবে। সে জমি তার কোন কাজে লাগবে? তা দিয়ে তার পেট চলবে? সংসার চলবে? এদেরও কর্ম সংস্থানের প্রশ্ন এসে গেল। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, এটা কৃষি অর্থনীতিতেও দিনের পর দিন প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফলে যতদূর সম্ভব চাষিদের মধ্যে জমি বণ্টন করার সাথে সাথে প্রতিটি পরিবারের সমর্থ লোকের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত যদি না করা যায়, তাহলে শুধু জমি বিলি করার আন্দোলনটাও তো একটা রাজনৈতিক চালাকি হয়ে গেল।

চাষি জমিকে ভালোবাসে। জমি পাওয়ার কথা বলে চাষিকে সহজেই উত্তেজিত করা যায় এবং সেই উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে চাষিদের সংগঠিত করার নামে রাজনৈতিক ফয়দাও সহজেই তোলা যায়। গ্রামীণ জীবনের মূল সমস্যাকে এড়িয়ে ডান-বাম নির্বিশেষে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান দলগুলি এই রাজনৈতিক খেলাই খেলে যাচ্ছে। আর একটি বিষয় লক্ষ করুন। একথা সকলেরই জানা, একটা দেশ উন্নত কি পিছিয়ে-পড়া তা বিচার করা হয় সেই দেশে কত লোক কৃষি অর্থনীতিতে, আর কত লোক শিল্প অর্থনীতিতে নিয়োজিত,

তার মাপকাঠিতে। অথচ এস ইউ সি আই ছাড়া, এদের সকলেরই কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচিতে — তা সে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রোগ্রামই হোক, আর কংগ্রেসের ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি-ই হোক, আর বি এল ডি র ক্ষুদ্র শিল্পের ফরমূলাই হোক — সকলেই কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিতে ছোট ছোট খেতখামারের নীতি অনুসরণ করে বেশিরভাগ মানুষকে গ্রামেই আটকে রাখতে চাইছেন। আবার একই সঙ্গে তাঁরা বলছেন, তাঁরা নাকি দেশটাকে উন্নত করতে চান। কী অদ্ভুত স্ববিরোধী রাজনীতি!

তাহলে এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা কী পেলাম? গ্রামে চাষির হাতে জমি তুলে দেওয়াটাই কৃষি অর্থনীতির মূল সমস্যা নয়। কারণ সে জমি চাষি ধরে রাখতে পারবে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে প্রক্রিয়ায় তার পূর্বপুরুষের জমি চলে গিয়েছে, তার জমিও সেভাবেই চলে যাবে। তাছাড়া 'ইকনমিক হোল্ডিং' হতে পারে, এমন পরিমাণ জমি সকলকে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। দেশে মোট জমির পরিমাণ বাড়ে না। ফলে জমি নয়, কর্মসংস্থানের প্রশ্নই গ্রামীণ জীবনের মূল সমস্যা। আর তার জন্য দরকার কৃষির আধুনিকীকরণ করা। এটা করলেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে মানুষগুলো আটকে থাকবে, সেই মানুষগুলোর আর্থিক জীবনের উন্নতি ঘটবে। গ্রামে বৈদ্যুতিকীকরণ হবে। কিছু কিছু কলকারখানা গড়ে উঠবে এবং সেখানে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আর গ্রামে যে মানুষগুলোর কর্মসংস্থান হবে না, সেই মানুষগুলোকে শহরে শিল্পাঞ্চলে কাজ দিতে হবে। তবেই গ্রামাঞ্চলের চেহারা পাল্টাবে। আজকের গ্রাম যেভাবে সাপ-ব্যাঙের আস্তানা, ভূতের বাসা হয়ে আছে, তার বদলে গ্রামগুলো আধুনিক ধরনের হবে। শহর আর গ্রামীণ জীবনের মধ্যে যে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে তা অনেকটা দূর হবে। আর এই কাজটি করতে হলে দরকার আমাদের দেশে শিল্পের অবাধ অগ্রগতির দ্বার খুলে দেওয়া।

কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্পের যে ক্রমাগত বিকাশ ঘটছে না, তার মূল কারণ কী? কারণ এখানে বাজার সম্প্রসারণ ঘটছে না। দেশের বাইরেও বাজার নেই, ভিতরেও বাজার নেই। এখানে গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা আশি থেকে তিরাশি ভাগ লোকই হচ্ছে সর্বহারা, আধা-সর্বহারা। তাদের কোনও কিছু কেনবার ক্ষমতা নেই। তারা চাল বিক্রি করে গম কিনে খায়। আর বাকি যে লোক শহরে থাকে, তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। যারা চাকরিবাকরি করে, তাদেরও প্রকৃত মজুরি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ক্রমাগত কমছে। এখানে বাজার সম্প্রসারণ ঘটবে কী করে? আর এখানে বাজারের সম্প্রসারণ যেহেতু ঘটছে না, তাই কৃষির আধুনিকীকরণও করা যাচ্ছে

না। কারণ, এই অবস্থায় কৃষির আধুনিকীকরণ করতে গেলে এক ধাক্কায় যে কোটি কোটি লোক বেকার হয়ে যাবে, সেই বিশাল বেকারবাহিনীর চাপ কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থাই সামাল দিতে পারে না।

পণ্ডিত বলে পরিচিত একজন বলে বসলেন, বেকার বাহিনীকে স্থায়ীভাবে মজুত রেখে দর কষাকষি করতে পুঁজিবাদই বেকার সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায়। বেকার সমস্যা জিইয়ে রাখতে চাওয়া, আর এক ধাক্কায় কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি করা কি এক জিনিস? মোটেই এক জিনিস নয়। নয় বলেই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে গ্রামেই আটকে রাখতে এদের টোটকা-হাকিমিরও শেষ নেই। ফলে পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক আজ কৃষির আধুনিকীকরণ এবং শিল্পের অগ্রগতির পথ আটকে রেখেছে। এখানে শিল্পের লাগাতার অগ্রগতির দরজা খুলে দিয়ে কৃষির যন্ত্রীকরণ করতে হলে দরকার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী আর্থিক সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করা। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা দরকার। কিন্তু একাজ কী করে করবেন? পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থাটা কি শুধু অর্থনৈতিক নিয়মের জোরেই টিকে আছে নাকি? একে রক্ষা করার জন্য রয়েছে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র।

এই রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি? মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্র আর সরকার এক নয়। একটা গোলমাল এখানে সবসময় সৃষ্টি করে রাখা হয়। বোঝানো হয়, যেন সরকারই সব। যেন সরকারটা দখল করতে পারলেই রাষ্ট্রটাকে যেমন খুশি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। বলা হয়, যত নষ্টের মূলে রয়েছে সরকারে থাকা ঐসব বদ লোকগুলো। ওদের হটিয়ে দিয়ে যদি আমাদের মতো ভাল লোকেরা সরকারে যেতে পারি তবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিপ্লব-টিপ্লবের হাঙ্গামার আর দরকার নেই। এ ধারণার মধ্যে না আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, না আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নকে, তাকে উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিকে লঘু করে দেখা এবং মানুষকে ভোটের রাজনীতিতে আটকে রাখা। আপনাদের মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে কোনও বিপ্লবী আন্দোলন ভাবাই যায় না।

এই যে শোষণমূলক ব্যবস্থা আমাদের দেশে টিকে রয়েছে, একে টিকিয়ে রেখেছে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র। রাষ্ট্রের তিনটি শাখা, অর্থাৎ তিনটি স্তম্ভ — মিলিটারি, পুলিশসহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা, আর বিচারবিভাগ। এই তিনটিই রাষ্ট্রের স্থায়ী সংস্থা। ইলেকশনের দ্বারা সরকার পাল্টালেই এগুলো পাল্টায় না।

সমঝোতা করে সরকার পাল্টালেও এগুলো যায় না। ক্যুপ করে সরকার পাল্টালেও যায় না। এর একটা কি দুটো ব্যক্তি এদিক ওদিক হতে পারে মাত্র। রাষ্ট্র হচ্ছে অনেকটা যন্ত্রের মতো। আর সরকার হচ্ছে সেই যন্ত্রের পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ার, অপারেটার বা মিস্ত্রি। এক একটা বিশেষ রাষ্ট্রযন্ত্রের ধরনধারণ, কায়দাকানুন, মানসিক ধাঁচা, নিয়মকানুন, চলবার রীতিনীতি — তার তিনটি স্থায়ী সংস্থা নিয়ে এক ধাঁচে বাঁধা। যেমন করে একটা মেশিন, তার বিভিন্ন পার্টসগুলো একটা নিয়মে জোড়া দেওয়া হয় এবং একই নিয়মে কাজ করে। অপারেটারকে সেই নিয়ম মেনে কাজ করতে হয়। সেই মেশিন দিয়ে সে অন্য কাজ করতে পারে না। যেমন একটা কাপড়ের কল, সে শুধু কাপড়ই বুনবে। অপারেটার ভাল হলে, বা তাঁতি ভাল হলে, ভাল কাপড় বুনবে অল্প সময়ে। তাঁতি খারাপ হলে, অজ্ঞ হলে কম কাপড় বুনবে, সময় নেবে অনেক। এইটুকু মাত্র পার্থক্য। ঠিক সেইরকম পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থায় শোষণ করাই সম্ভব। শোষণটা মিষ্টি করে করবে, সহ্য করিয়ে করিয়ে নিয়ে করবে, এবং শোষণটা করবার সময় তারই সঙ্গে মলম মাখাতে থাকবে কি না, সেটা আলাদা কথা। একদল শোষণ করে চাবুক ঘুরিয়ে, আর একদল শোষণ করে, আবার তারই সঙ্গে যাদের শোষণ করে তাদের একটু ডাব খাওয়ায়, কমলালেবুর রস খাওয়ায়, মাখন খাওয়ায়। কিন্তু শোষণটা ঠিকই করে যায়। আর শোষণ নিয়ে প্রশ্ন করলে বলে, এই যে এত ডাব খাওয়াচ্ছি, এত ফলের রস খাওয়াচ্ছি, বুঝতে পারছেন না, কত ভালবাসি আপনাদের। আমি তো চেষ্টা করছি। কি করব, পারছি না। একটু সময় লাগবে। আর একটু সময় দিন।

এই করে করে দুশো বছর ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষের জঞ্জাল হটাতে কংগ্রেস সাতাশ বছর পার করে দিল। আবার কংগ্রেসকে হটিয়ে যাঁরা আসবেন, তাঁরা আরও পনেরো-কুড়ি বছর নেবেন, আর আপনাদের ক্রমাগত জানিয়ে যাবেন — কি করব বলুন, কংগ্রেস তো সব শেষ করে দিয়ে গেছে, আমাদের সামলে উঠতে একটু সময় দিন। এরপর অন্য কেউ এলে একইভাবে বলবে। এইভাবে সময় চলেই যাচ্ছে। জনসাধারণের অবস্থার কোনও বদল ঘটছে না। শোষণের জগদ্দল পাথরটা আরও শক্ত হয়ে চেপে বসছে। ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য থেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যদি মুক্ত করতে হয়, তাহলে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে তার একমাত্র পথ।

অনেকে আমাদের দেশের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে হেসে উড়িয়ে দেন

তার অনগ্রসরতার জন্য, দেশজ চরিত্র না থাকার জন্য এবং প্রযুক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতার জন্য। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা এগুলো থাকা বা না-থাকার উপর নির্ভর করে না। এগুলো পুঁজিবাদের অসহায়তা, লাচারি, জটিলতা এবং নির্ভরশীলতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পুঁজিবাদের মৌলিক কথা হল প্রথমত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নীতি চালু হয়েছে কি না। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কি না। দেখতে হবে, মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন হচ্ছে কি না, 'পণ্য-টাকা-পণ্য'র পরিবর্তে 'টাকা-পণ্য-টাকা'এই নিয়ম সেখানে কাজ করছে কি না, কলকারখানায় হোক আর জমিতেই হোক, টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ানো হচ্ছে কি না মজুরকে শোষণ করে। দেশজ হোক আর বিদেশি প্রযুক্তি নিয়েই হোক, এই প্রক্রিয়াটি অর্থনীতিতে চালু হয়েছে কি না। বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা থাকলে জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশাত্মবোধকে পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইতে আমরা কিছুটা কাজে লাগাতে পারি মাত্র। কিন্তু ব্যবস্থাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী, তার উৎপাদনের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা যে করেই হোক সংগ্রহ করা, আর উৎপাদন-সম্পর্ক হল মালিক-মজুর সম্পর্ক —- তা কলকারখানাতেই হোক, আর জমিতেই হোক।

আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়া কৃষি অর্থনীতির জন্য পুরনো সামন্তী ব্যবস্থার কতকগুলো রীতিনীতি, ঢং ঢাং, আচার-সংস্কার গ্রামীণ সম্পর্কের রূপে সেখানে খাদ হয়ে মিশে আছে, যেমন সোনার মধ্যে খাদ মিশে থাকে। তাই বলে সেই খাদটাকে আপনারা সোনা বলেন নাকি? এই খাদটা কেন মিশল, সেটা বুঝতে হলে বুঝতে হবে, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কোন অবস্থায়, তার বাজার সংকটের কোন পরিস্থিতিতে, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের কোন সংকটাবস্থায় এদেশের পুঁজিবাদ কৃষি অর্থনীতিতে ঢুকেছে এবং কৃষি অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছে। এটা বুঝলেই বোঝা যাবে, কেন অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের মতো এখানে পুঁজিবাদ মেশিন-ট্র্যাকটর দিয়ে আধুনিক প্রক্রিয়ায় কৃষিতে চাষবাস করতে পারে না। কিন্তু কৃষি অর্থনীতি পিছিয়ে-পড়া কি অগ্রসর, যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষ হয় কি হয় না — এটার উপর কৃষি-অর্থনীতির চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক, কি পুঁজিবাদী, কি সমাজতান্ত্রিক, তা নির্ভর করে না, অন্তত আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে তো করেই না। তাহলে কৃষি অর্থনীতির চরিত্র কী দিয়ে বোঝা যাবে? বোঝা যাবে কৃষিজাত পণ্যের চরিত্র এবং তাকে নিয়ে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সিস্টেম গড়ে উঠেছে, তার চরিত্র বিচার করে। অর্থাৎ কৃষিজাত উৎপাদন কি পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্য? নাকি তা গ্রামীণ স্থানীয় ভিত্তিক

বাজারের পণ্য? নাকি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত? এগুলোর দ্বারা নির্ধারিত হয় কৃষি-অর্থনীতিটি পুঁজিবাদী অর্থনীতি, নাকি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি, না সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি?

দ্বিতীয়ত, দেশে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি কত খাটে বা দেশটা অর্থনীতিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল কি না, হলে কতটা নির্ভরশীল — এটাও রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি না, তা বিচারের ক্ষেত্রে মূল বিষয় নয়। লেনিন আলোচনা করে দেখিয়েছেন, এ প্রশ্ন ধরলে বলকান রাষ্ট্রগুলি, জারের রাশিয়া, এমনকী ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকা অর্থনীতির দিক থেকে ইউরোপের কলোনি ছিল। কাজেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি না, এই বিচারের ক্ষেত্রে এটা কোনও বিষয়ই হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে সেই রাষ্ট্রযন্ত্র, যা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে তার দেশে তার ক্ষমতানুযায়ী তার দেশের পুঁজিবাদের আপেক্ষিক অর্থে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশের জন্য চেষ্টা করে। দ্রুত সে পারছে কি না আলাদা কথা, কারণ তা অনেক জিনিসের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সে পুঁজিবাদের বিকাশের জন্যই চেষ্টা করে। তাই মার্কস 'ক্যাপিটাল' কী তা বোঝাতে গিয়ে দু'টি কথার উপর জোর দিয়েছেন। একটা হচ্ছে উৎপাদনের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ উৎপাদনের 'মোটিভ ফোর্স', আর একটা হচ্ছে উৎপাদন-সম্পর্ক। এই পুঁজিবাদ গোড়ায় তার বিকাশের যুগে দেশজ রাস্তায় গড়ে উঠেছে। আর সাম্রাজ্যবাদের যুগে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতায়, তার থেকে ব্যবহারিক জ্ঞান নিয়ে বা তার উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে। তারপর যতটুকু গড়ে উঠছে ততটুকু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে। এইভাবে যারা খানিকটা গড়ে উঠছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে তাদের সংঘাতটা আরও একটু বড় আকারে দেখা দিচ্ছে। তারা নিজেরা সাম্রাজ্যবাদী হচ্ছে। এটা একটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

তাহলে আসল কথা হচ্ছে, ভারত রাষ্ট্র এখানে আমদানি নীতির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে দেশের শিল্পের বিকাশের রাস্তা খুলে দিচ্ছে কি না, দেওয়ার পর শিল্পের বিকাশ হচ্ছে কি না আলাদা কথা। এই প্রশ্নেই একদল বলছেন, আমাদের গরিব দেশ, আমাদের পুঁজি নেই — এটাই আসল সমস্যা, পুঁজিবাদ এখানে সমস্যা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতি থেকে, ব্যবসাবাণিজ্য থেকে, কলকারখানাগুলো থেকে প্রতিদিন যতটুকু পুঁজি গড়ে উঠছে, তার পুরোটা শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে কি? নাকি পুঁজির আমলাতান্ত্রিক আর অলস হয়ে পড়ার প্রবণতা এখানে ক্রমেই বাড়ছে? এই আমলাতান্ত্রিক কথাটার

দ্বারা আমি বোঝাতে চাইছি যে, পুঁজিটা গড়ে ওঠার পর বাজারে তেজিভাব না থাকার জন্য শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার চাহিদা থাকে না, সেটা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় হয়। ফলে তার একটা প্রতিক্রিয়া অর্থনীতির উপর পড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পপণ্যের বাজার যদি থাকে, তাহলে উৎপাদন বাড়াবার জন্য পুঁজি কম থাকলে পুঁজি আরও দরকার হয়। কিন্তু এ তো যতটুকু উৎপাদন আমাদের দেশে হচ্ছে, তারই বাজার নেই। তার জন্য লে-অফ, ছাঁটাইয়ের ধমকি চলছে। লে-অফ হয় কেন? কারণ, যতটুকু মজুত উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে নানা কারখানাগুলোতে, উৎপাদন করবার যতটুকু শক্তি রয়েছে সেখানে, তাকেই পুরো সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সেগুলো অলস হয়ে বসে থাকছে, বাজার নেই বলে। তাই লে-অফ করতে হচ্ছে। রাউরকেল্লা, দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানাগুলিতে স্বাভাবিক সময়েও উৎপাদিকা শক্তির শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বাকিটা অলস পড়ে থাকছে।

তাহলে আসল সমস্যা হচ্ছে, বাজার নেই। আর বাজার না থাকলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের চাহিদা থাকে না। তাই দেখুন, মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে। শিল্পে অগ্রগতি স্তব্ধ। দুটো নতুন কারখানা গড়ে উঠছে তো বিশটা কারখানা লালবাতি জ্বালছে। লেঅফ, লক -আউট, ক্লোজার, ছাঁটাই বাড়ছে। আধা-বেকার, পুরো বেকারে দেশটা ছেয়ে গিয়েছে। এ সবের কারণ, যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক এদেশে কায়েম রয়েছে, তা অচল হয়ে গিয়েছে, অকার্যকরী হয়ে গিয়েছে। শিল্পে-কৃষিতে যত সমস্যা, বা বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি সহ সব সমস্যার পেছনে মূল কারণ বা মূল সমস্যা এইটাই, অর্থাৎ আমাদের দেশের শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে রক্ষা করছে আমাদের দেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র। এর থেকে আমাদের বাঁচার পথ কী? এর একমাত্র পথ হচ্ছে, ভারতবর্ষের বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা বিকল্প শক্তি, যেটাকে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম বলা হয়, একেবারে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত গণআন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে তার জন্ম দেওয়া। সেটা আমরা কীভাবে দিতে পারি? একাজ একমাত্র সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে গণআন্দোলনগুলোকে পরিচালিত করা ছাড়া কখনই সম্ভব হতে পারে না।

সকলেই জানেন, আমরা এখনও যুক্ত গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে চলছি এবং এই স্তরটা আরও বেশ কিছু দিন চলবে, যতদিন না মূল শত্রু ও বিপ্লবী পার্টির মধ্যে অবস্থানকারী বিভিন্ন আপসকামী শক্তি রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত হচ্ছে। এখন এই যুক্ত আন্দোলনে যেমন বিপ্লবী পার্টি রয়েছে, তেমনি রয়েছে

বামপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট নামধারী নানা অবিপ্লবী, মেকি মার্কসবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তি এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তি — যাদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক লাইন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আলাদা। ফলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে যে যুক্ত গণআন্দোলনগুলো এখানে গড়ে উঠছে, মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সেই গণআন্দোলনগুলোকে বিপ্লবী রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যুক্ত গণআন্দোলনের মধ্যে তার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও রাজনৈতিক লাইনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের সাথে বিপ্লবী দলের আদর্শগত সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়। যেমন আমরা বলছি, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, ফলে ভারতবর্ষের বিপ্লবটা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তার একটা ভিন্ন রণনীতি। যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন, তাঁরা বলছেন, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করাই আশু কর্তব্য — পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা নয়। তাঁরা ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণির শাসন, জুলুম, অত্যাচারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতি বা বৃহৎ ব্যবসায়ীর ঘাড়ে চাপিয়ে গোটা বুর্জোয়াশ্রেণিকেই জনতার ক্রোধ থেকে আড়াল করতে চাইছেন। তার বিপ্লবের শত্রু ও শ্রেণিমিত্রের ধারণা আলাদা। ফলে, তার রণনীতি আলাদা। তার কৌশলগত নানা প্রশ্ন আলাদা।

তাহলে, আমরা যারা জনগণের সাধারণ দাবিগুলোকে ভিত্তি করে একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এই ভিন্ন ভিন্ন রণনীতি নিয়ে এক জায়গায় আসছি, আমাদের এই রণনীতিগুলোর পার্থক্য অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা প্রতিদিনের এই সম্মিলিত আন্দোলনগুলোর মধ্যে দেখা দেবে কি? যদি না দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের রণনীতিগুলো শুধু লেখবার জন্য, আর বলবার জন্য, গণআন্দোলনগুলোকে রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে তার কোনও তাৎপর্য নেই। তা না হলে গণআন্দোলনগুলোকে তাঁরা যেমন তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি অনুযায়ী তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চাইবেন, তেমন আমাদের দল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাস করে, সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি অনুযায়ী গণআন্দোলনগুলোকে আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চাইব। ফলে, যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রণনীতিকে কেন্দ্র করে আদর্শগত সংঘাত দেখা দেবেই। তাই এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ সকলেই বিপ্লবের মূল রণনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় কতকগুলো মূল জিনিস এনেছেন। আমি বিপ্লবের রণনীতির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বলব, এই রণনীতির তিনটি প্রধান অঙ্গ। একটা হল, বিপ্লবের উদ্দেশ্য কী, অর্থাৎ

বিপ্লবের সামনে মূল শত্রু কে? কাকে উচ্ছেদ করতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে এবং উচ্ছেদ করে সেখানে কী প্রবর্তন করতে হবে? দু'নম্বর হল, বিপ্লবের নেতা কে? আর তারই মধ্যে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে দিচ্ছি — বিপ্লবের রণনীতিগত মৈত্রী (strategic alliance) এবং 'রণনীতিগত স্লোগান' (strategic slogan) কি হবে? তিন নম্বর হচ্ছে, 'ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো'। এটা আমার কথা নয়। যাঁরা হাতে-কলমে বিপ্লব করেছেন, দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মতোন বা মেকি মার্কসবাদীদের মতোন বিপ্লবের কথাটা শুধু মুখে বলেননি, তাঁরা সকলেই বিপ্লবী রণনীতির মধ্যে এই 'ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো' নীতিটির কথা বলেছেন। অথচ সেদিন 'গণশক্তিতে' জ্যোতিবাবুর একটা লেখা পড়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চলতি একটা ভালমানুষী ধারণা আছে যে, ঐক্যের মধ্যে পরস্পর একটু বেশি সমালোচনা — এটা ঠিক নয়। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সেই ধারণাকে কেন্দ্র করে 'গণশক্তি'র ওই লেখায় তিনি আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, আমি শুনতে পাই, সি পি আই (এম)-এর কর্মী সমর্থক বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাই নাকি আমাদের প্রধান রাজনীতি। তাঁরা বলেন, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধেই শুধু সমালোচনা করি এবং আমাদের কাগজ ওল্টালেই শুধু সি পি আই (এম)-এর সমালোচনাই দেখা যায়। যদিও কথাটা পুরো সত্য নয়, আংশিক সত্য মাত্র। তাঁরা বুঝতেই পারছেন না, এটা কেন ঘটছে। এতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কী আছে? এটাই তো স্বাভাবিক।

এঙ্গেলস বলেছেন, মেকি সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তাঁর এবং মার্কসের সারাটা জীবন কেটে গিয়েছে। এর জন্য দুঃখ করার কিছু নেই। কারণ এটা অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম। এ সংগ্রাম অস্বীকার করলে গণআন্দোলনকে বিপ্লবী রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করা হয়। রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে বলশেভিকদের দ্বারা অনুসৃত বিপ্লবের রণনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় স্ট্যালিন নিজে বলেছেন যে, জারের বিরুদ্ধে যখন তাঁরা লড়ছেন, যখন বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে জারকে উচ্ছেদ করা, তখন 'ক্যাডেট'দের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের আদর্শগত আক্রমণ মূলত কেন্দ্রীভূত হতে দেখে একদল বলল যে, বলশেভিকরা 'ক্যাডেটোফোবিয়ায়' ভুগছে। তারা জারকে শত্রু মনে করে না। তাদের কাছে জারের সমালোচনা পেছনে চলে গিয়েছে। যে ক্যাডেটদের সঙ্গে জারের বিরুদ্ধে একত্রে তারা লড়ছে, সেই ক্যাডেটদের সমালোচনাই ওদের বেশি।

স্ট্যালিন বলছেন যে, এরা বুঝতেই পারেনি বলশেভিক রণনীতির তাৎপর্য। ক্যাডেটরা ছিল জার এবং চাষিদের মাঝখানে আপসকামী শক্তি। যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে তাদের যদি জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না যেত, তাহলে জারের বিরুদ্ধে ব্যাপক চাষি অভ্যুত্থান বলশেভিকরা ঘটাতেই পারত না এবং ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর এত সহজে ক্যাডেটদের এবং বুর্জোয়া সরকারের দ্রুত পতন ঘটানো সম্ভব হত না।

আবার বলছেন যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব মারফত বুর্জোয়াশ্রেণি ক্ষমতা দখল করার পর সম্মিলিত আন্দোলনের সংগঠন সোভিয়েতগুলোতে — যার ভিতরে সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি, মেনশেভিক ও অন্যান্যরা সকলে ছিল, সেখানে মেনশেভিক আর সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের বিরুদ্ধেই বলশেভিকদের তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম এবং মতাদর্শগত আক্রমণ মূলত কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে। তখনও এই অনুযোগ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে যে, এরা মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদ আর বুর্জোয়াশ্রেণিকে ফেলে সমাজতন্ত্রী এবং মার্কসবাদীদের গালাগালি করছে। মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সমালোচনা তাদের পেছনে চলে গিয়েছে। তারাও বুঝতে পারেনি যে, বুর্জোয়াশ্রেণি, সাম্রাজ্যবাদ ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের মাঝখানে ছিল এই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক রাজনীতি আপসের সেতু অর্থে, যাকে প্রতিনিধিত্ব করত মার্কসবাদের নামে সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিরা, মেনশেভিকরা। সোভিয়েতগুলোতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে ওই মেকি মার্কসবাদী ভ্রান্ত রাজনীতিকে পরাস্ত করতে না পারলে নভেম্বর বিপ্লবের বিজয় ছিল অসম্ভব।

এই 'ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো' নীতিটি স্ট্যালিন বলছেন, বিপ্লবের রণনীতির মধ্যে একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় নীতি হিসাবে রয়েছে। আর দলের পলিটব্যুরোর সদস্য হয়ে জ্যোতিবাবু 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত তাঁর ওই লেখায় সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে আমরা যে রাজনৈতিক সমালোচনা করে থাকি, তাকে কেন্দ্র করে ঠিক অনুরূপ অভিযোগটিই আমাদের বিরুদ্ধে তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এস ইউ সি আই-এর রাজনীতি হচ্ছে — কংগ্রেস মূল শত্রু এবং সি পি আই(এম) হচ্ছে প্রধান বিপদ। এই প্রধান বিপদকেই বিপ্লবের রণনীতিতে ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো বলা হচ্ছে। আমি বলতে চাইছি, এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থে সি পি আই(এম)-কে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি মনে করি। আমরা তাদের যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনে করলে তো তাদের সঙ্গেই যেতাম। তেমনি তারাও নিজেদের

নিশ্চয়ই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে মনে করেন। তাহলে তাদের বিচারেও আমরা যতই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলি না কেন, আমরা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ছাড়া আর কিছু নয়। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে যে লড়াইগুলো দেশের মধ্যে গড়ে উঠছে, সেই লড়াইতে তাদের বিচারে বিপ্লবী আন্দোলন এবং শাসকশ্রেণির মধ্যে আমরা হলাম আপসকামী শক্তি। আর আমাদের বিচারে যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণি ও বিপ্লবী আন্দোলনের মাঝখানে তাঁরা হচ্ছেন আপসকামী শক্তি। তাহলে যুক্ত আন্দোলনে এই দুই লাইনের সংগ্রাম চলবেই। নাহলে গণআন্দোলনে সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন প্রতিষ্ঠিত হবে কী করে? স্ট্যালিন থিসিসরূপেই বলেছেন, শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রেসির ধারাকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করাই সম্ভব নয়।

তাহলে যে বিপ্লবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে — সেই বিপ্লবে কার 'ইনস্টেবিলিটিকে' 'প্যারালাইজ' করতে হবে যুক্ত আন্দোলনে? সেখানে 'ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো' কার বিরুদ্ধে হবে? স্ট্যালিন বলছেন, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবে এই 'ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো' হবে রকমফের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক বিভিন্ন ধারাগুলির বিরুদ্ধে — যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবের কথাও বলে, জঙ্গি আন্দোলনও করে, কিন্তু অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার চৌহদ্দির বাইরে এই আন্দোলনগুলোকে যেতে দেয় না এবং জনগণের কোরবানির সমস্ত ফলটুকু শেষপর্যন্ত তারা ইলেকশনে নিয়ে যায়। বিপ্লবের রণনীতির এই ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো কথাটা যদি জ্যোতিবাবু বুঝতেন, তাহলে সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে তাঁর এই অনুযোগ থাকত না, আক্ষেপ করার কোনও কারণ থাকত না এবং আমাদের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভও থাকত না। জ্যোতিবাবু কথাটা এমনভাবে বলছেন যেন, এই ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো, অর্থাৎ বিপ্লবী গণআন্দোলনে মূল বিপদ কী — এটা অঙ্গুলি নির্দেশ করার মানেই হল, মূল শত্রুর প্রশ্ন গুলিয়ে ফেলা। একথা তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁরা বিপ্লবের রণনীতির আসল কথাগুলো জনতার কাছে চেপে রাখতে চান, অথবা নিজেরা জানেন না। তাঁদের ক্ষেত্রে এর কোনটাকে সত্য বলে আমরা ধরে নেব?

তাঁরা একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন যে, একসঙ্গে কাজ করা আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা — এ জিনিস চলতে পারে না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? এটা কি কোথাও লেখা আছে নাকি? এই যে একটা

ধারণা তাঁরা অনেকেই পোষণ করছেন, এটা সমাজে এল কোত্থেকে? খোঁজ করে দেখেছেন, কোথা থেকে এল এসব ধারণা? ভাল করে খোঁজ করলেই দেখতে পেতেন, তাদের এই ধারণাটিও বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক রাজনীতির প্রভাব থেকে এসেছে। এটি একটি ক্ষতিকারক ভালমানুষী ভাব ছাড়া আর কিছু নয় — যা আসলে গণআন্দোলনের মধ্যে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মানসিকতাকে মেরে দেওয়ার ষড়যন্ত্র মাত্র। একমাত্র বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাই আদর্শগত আলোচনা ও সমালোচনাকে ভয় পায়, বিশেষ করে তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের মুখে। এই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক রাজনীতির প্রভাব থেকেই তাদের এই মানসিকতা গড়ে উঠছে। তা না হলে তো তাদের জানার কথা যে, বিপ্লবের রণনীতির তিনটি মূল অংশের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে — এই 'ডাইরেকশন অফ দ্য মেইন ব্লো'।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, সংযুক্ত আন্দোলনে যারাই কোনও না কোনও যুক্তির আড়ালে এই আদর্শগত সংগ্রামকে বাধা দিতে চায়, যারা অর্থনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার লড়াইগুলোকে রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চায় না, তারাই বাহানা তোলে — আদর্শগত সংগ্রামের নামে কুৎসা করা চলবে না। কুৎসাটা কী? আমরা সি পি আই(এম) বন্ধুদের বলেছিলাম, সকলে মিলে ঠিক করুন না, কোনটা নীতিসম্মত সমালোচনা, আর কোনটা কুৎসা। এরকম একটা কিছু যদি সকলে মিলে ঠিক করতে পারেন, আর আমরা সেটা মেনে না নিই, তখন আমাদের বিরুদ্ধে বলবেন। আপনারাই বলছেন, তা বাঁধা সম্ভব নয়। এরকম তো হতে পারে না যে, কারওর ভুল রাজনীতি অনুসরণের জন্য তার আলোচনা ও সমালোচনা যদি তাদের বিপদগ্রস্ত করে, যেটা করাই স্বাভাবিক, তাহলেই তাঁরা গায়ের জোরে বলবেন, এটা কুৎসা হচ্ছে, এ জিনিস করা চলবে না এবং সেটাই অপরকে মেনে নিতে হবে। আপনারাই বলুন, এ জিনিস কি কখনও মেনে নেওয়া যায়? তাহলে ভুল রাজনীতির প্রভাব থেকে যুক্ত আন্দোলনকে মুক্ত করা যাবে কী করে?

আপনারা যুক্ত আন্দোলনের কোনও আচরণবিধি আজ পর্যন্ত তৈরি করেননি। আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে ভিতরে-বাইরে কী বলেন, কী ভাষায় বলেন, আমরা জানি। আপনাদের পত্র-পত্রিকায় ও কাগজপত্রে সমালোচনার নামে স্বনামে-বেনামে আমাদের বিরুদ্ধে কী সব ভাষা ও উক্তি করা হয়, তার সাথেও সকলেই পরিচিত। কিন্তু এ নিয়ে আমরা কোনওদিন প্রশ্ন করিনি। আমরা বলেছি, এগুলোর দ্বারাই যদি আপনারা আপনাদের রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যেতে

পারেন, করুন এবং বেশি করে করুন। শুধু আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না। আমাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম থেকে রাজনৈতিক সমালোচনার অধিকার আমাদের থাকবে। আমাদের চেয়ে আপনাদের অনেক বেশি শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র রয়েছে এবং লোকজনও রয়েছে। আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করুন এবং যেমনভাবে চান করুন। গণআন্দোলনে ঐক্যের নামে ও ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়েও এই দুই লাইনের রাজনৈতিক সংগ্রাম অস্বীকার করার মানে দাঁড়ায়, অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া এবং গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার চৌহদ্দির মধ্যেই গণআন্দোলনগুলোকে আটকে রাখা। এতে আপনাদের বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে, কিন্তু কোনও সত্যিকারের বিপ্লবী দলই এ কাজ করতে দিতে পারে না। একাজ তারাই চাইবে, যারা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। যদি সেদিক থেকেও বিচার করা যায়, তাহলেও দেখা যাবে, যেকোনও অজুহাতে ও যেকোনও যুক্তির আড়ালেই হোক, যারাই এ জিনিস চাইছে না এবং এটাকে বন্ধ করতে চাইছে, তারা তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের দ্বারাই প্রমাণ করছে যে, শত বিপ্লবের কথা বললেও তারা আসলে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তারা চায় না, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত গণআন্দোলনগুলো তার অভীষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছাক। বিপ্লবের কথা তারা শুধু মুখেই বলে। বিপ্লবটা তারা যথার্থ চাইলে, তারাও আমাদের মতো যুক্ত আন্দোলনে রাজনৈতিক সমালোচনার স্বাধীনতা নিয়ে লড়ত।

কাজেই, যে কথাটা আমি বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় যখন বামপন্থী ঐক্যের মধ্যে দুটো শক্তিশালী দল এস ইউ সি আই এবং সি পি আই(এম)-এর ঐক্য সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল, তখন একটা 'টিপিক্যাল' সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ছেঁদো কথা তুলে, বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যার কোনও সম্বন্ধ নেই, সি পি এম নেতারা সেই ঐক্য ভেঙে দিলেন এবং গণআন্দোলনের স্বার্থের দোহাই দিয়ে প্রফুল্লবাবুদের মতো জনগণ কর্তৃক ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে বোঝাপড়ার রাস্তায় পা বাড়ালেন। তাদের এই রাজনীতি কীসের ইঙ্গিত বহন করে? যাই হোক, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, একটা প্রোগ্রাম এবং একটা আচরণবিধির ভিত্তিতে এই ঐক্য গড়ে তুলুন। এরকম ইস্যুভিত্তিক ঐক্যের সমর্থক থাকবেন না। এই ইস্যুভিত্তিক ঐক্যের ফলেই যার যখন যেমন সুবিধা দেখা দিচ্ছে, সে তখন তেমন আচরণ করছে। সোস্যালিস্ট পার্টিকে দেখুন, তারা 'নবনির্মাণে'ও আছে, আবার আট পার্টির জোটেও আছে। সি পি আই(এম)-কে দেখুন, তারা '৭৩ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ আবিষ্কার

করলেন যে, সি পি আই যেসব নীতির জন্য কংগ্রেসের পক্ষে চলে গিয়েছিল, সেগুলোর থেকে তারা নাকি ধীরে ধীরে গণআন্দোলনের দিকে চলে আসছে। কারণ সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের দ্বারা নির্দেশিত 'একই বিন্দুতে মিলিত হওয়ার তত্ত্বের' (convergent theory) আড়ালে সি পি আই- এর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ২৭ জুলাই আট পার্টির ঐক্য ভেঙে দিয়ে তাঁরা বেরিয়ে এলেন এবং সি পি আই ও আই এন টি ইউ সি-র ধর্মঘটে গিয়ে সামিল হলেন। একাজ তাঁরা করলেন আট পার্টির ধর্মঘট ও বনধের নিজস্ব কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও। আর এস পি-কে দেখুন — ১৯৭২ সালে কংগ্রেস কারচুপি করে নির্বাচনে জেতার পর আমাদের যুক্ত নয় বাম দলের সিদ্ধান্ত ছিল আমরা বিধানসভায় যাব না। তাঁরা তাঁদের একটা সংকীর্ণ পার্টি রাজনীতির জন্য ঐক্যের পরোয়া না করে বিধানসভায় যোগ দিলেন। এসব এই কারণেই ঘটছে যে, ইস্যুর ভিত্তিতে ঐক্য করা হয়েছে, ফলে যে যার মতো চলছে। যদি প্রোগ্রামের ভিত্তিতে, আচরণবিধির ভিত্তিতে এটা একটা ফ্রন্ট হত, তাহলে আর এস পি এরকম আচরণ করতে পারত না। সোস্যালিস্ট পার্টিও এরকম আচরণ করতে পারত না। সি পি আই(এম) এভাবে আট পার্টির ঐক্য ভেঙে দিয়ে সি পি আই এবং আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে যেতে পারত না, আর নয় বামের ঐক্য ভেঙে দিয়ে 'নবনির্মাণে'র সঙ্গে একটা সম্মেলন করতে পারত না।

তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক লাইনকে কেন্দ্র করে মতাদর্শগত বিরোধিতা আছে এবং থাকবে। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, ক্ষোভ প্রকাশেরও কোনও কারণ নেই। কিন্তু জরুরি কাজ হচ্ছে, সর্বসম্মত একটা কর্মসূচি ও আচরণবিধির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং জনতার হাতে লড়াইয়ের একটা হাতিয়ার তুলে দেওয়া। এটা গড়ে তুলতে পারলে একমাত্র তখনই বোঝা যাবে, কারা গৃহীত আচরণবিধি মানছে না এবং কারা ঐক্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সর্বশেষে জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, আপনারা সকলে এই কথাটা নিয়ে লড়ুন। এস ইউ সি আই ঐক্য চায়, আমরা ঐক্য চাইছি আট পার্টির সঙ্গে। কিন্তু এস ইউ সি আই নীতি বিসর্জন দিতে পারে না, রাজনৈতিক লাইনের সংগ্রাম বিসর্জন দিতে পারে না। দরকার হলে এস ইউ সি আই একাই পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের সকলের কার্যকরী সহযোগিতা চাইব। পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য নবনির্মাণের সঙ্গে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমি সকলকেই হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, এত কাণ্ডের পরেও পশ্চিমবাংলায় দক্ষিণপন্থীরা জায়গা করতে পারেনি। আন্দোলনের নামে শুধু

কতগুলো ইস্যুর ভিত্তিতে তাদের সঙ্গে মিটিং-মিছিল করলে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে তাদের অনুপ্রবেশের রাস্তা করে দেওয়া হবে। ফলে প্রফুল্লবাবুদের সাথে বন্ধুভাবে মেশার সি পি আই (এম)-এর এই রাজনীতিকে পরাস্ত করতে না পারলে বামপন্থী আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত দুর্বল হবে। কাজেই আমার আবেদন, এই বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতিকে পরাস্ত করে বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আপনারা সকলে কার্যকরীভাবে এগিয়ে আসুন।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ২৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৫ সালের ২৪ এপ্রিল ময়দানের জনসভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ভাষণ দেন। এইটিই ছিল প্রকাশ্য সভায় তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা। ২০১১ সালের ৫ আগস্ট প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।